রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্য কলকাতা

তামাম হিন্দুস্তানকে আমরা কুর্তা-কামিজ পরিয়ে রেখেছি

শুধু সাদা চামড়ার প্রশংসা নয়, ইংরেজ আমলের সুখ্যাতি চলেছে বংশ পরম্পরা। সাদাচুল, সাদানুর, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া রহিম চাচা থেকে শুরু করে রাজেশ খান্না কাট কুর্তার ভেতর থেকে ঘাড় পর্যন্ত চুলো মাথার তরুণ মহঃ ইসমাইল পর্যন্ত সবাই সুদিন বলতে বোঝেন ঐ ইংরেজ আমল। মাজা ঘষা, পরিপাটি জাতীয় চেতনার বেলুনে মেটিয়াবুরুজ এভাবেই প্রথম সুচটি ফুটিয়ে দিল। প্রাথমিক ধন্দ কাটলে, ওদের অগোছাল অথচ ঘটনার মাইলস্টোনে ধরা সমাজ-ইতিহাস কাহিনীর ঢঙে বলতে দিলে কয়েকটি জরুরি শিক্ষা পাওয়া সম্ভব : ।১। সমাজ শরীরে নিজেদের বেশ প্রয়োজনীয় দেখতে চান তাঁরা ।২। বৃত্তি ব্যক্তিত্ব প্রকাশেরও একটা পথ দেবে ।৩। নিত্যকার শ্রমে উৎপন্ন বস্তুর সঙ্গে দর্জি শিল্পী হিসাবেই চিহ্নিত হতে চান ।৪। রাক্ষুসে বাজারের যোগানদার হিসাবে রাতদিনের কাজে কেবল পেটের জন্য হন্যে অবস্থা গোলামীর নামান্তর ।৫। আর নোংরা, জলা, জীর্ণহতাশ জীবনে এতাবৎ তাঁরা স্বাধীনতার পাঁড়াকে প্রত্যক্ষ করেননি।

নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা এভাবে বলবেন, 'বাবু কাজটা হল গে নজর আর ধিয়ানের (ধ্যানের), মিটিয়াবুরুজির দর্জির নাম তো মিনামাগনা হয়নি, জোরির কাজ করে ছুচের পেঁাদে সুতোয়, ফোঁড়ে. কাঁচিতে। ফুটবলের যাদুকর সমাদ, বর্মা মুলুক খেলতে গিয়ে তিন তিনবার গোল দেওয়ার কোশিস করে ব্যর্থ হলেন। সমাদ তখন বললেন বারের মাপ নেওয়া হোক, দেখা গেল ওপরের বার আধ ইঞ্চি ছোট—সেখানে লেগেই বল তিনবার ফিরে এসেছে। মেটিয়াবুরুজের সাদচুল বৃদ্ধ দর্জি শিল্পীদের কেন্দ্র করেও আছে এরকম হাজার এক কিংবদন্তী। সাহেবের জামা প্যাণ্টের মাপ নিয়ে এলেন মেটিয়াবুরুজের এক নম্বর দর্জি। কি ভাবে মাপ নিলেন ? ফিতে ব্যবহার করলেন না. এমন কি সেকেলে দর্জিদের মতো বিঘৎ মাপতেও গেলেন না, দূর থেকে চোখ পিট পিট করে দেখলেন। ব্যস্, খোপরিতে মাপ লেখা হয়ে গেল। অর্ডার দিয়ে সাহেব গেলেন বরফের মুলুকে। ফিরে এলে দর্জি প্যাণ্টলুন নিয়ে গেলেন। বেশ আঁটো হল কিন্তু দর্জি বিন্দুমাত্র না ঘাবড়ে তুরন্ত জবাব দিলেন, সাহেব ওজন করান, আপনার গতি লেগেছে। আরেক বারের কথা মেমসাহেবের বায়না এল এমন গাউন চাই যা দুনিয়ায় নতুন! দর্জি জো হুকুম বলে চলে গেলেন। গাউন পেয়ে মেমসাহেবের গাল কাশ্মীরী আপেল। তার থেকে তাজ্জব কান্ড ৬ মাস বাদে প্যারীর

ফ্যাসনের পত্রিকা 'লো-মোড-প্যারীর' প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হল হুবহু সেই ডিজাইন। স্মরণ রাখতে হবে মেটিয়াবুরুজের দর্জি তখনও আজকের মতই নিরক্ষর। এবং এসব কাহিনীতে খুদার কসম, গুলগাপ্পা কিছু নেই। তালাশ করলে প্রমাণ এখনও পাওয়া সম্ভব। মেটিয়াবুরুজের দর্জির সুনাম তখন নীল জলরাশি ভেঙ্গে সাত সমুদ্র পেরিয়ে গিয়েছে। কলকাতার দর্জি শিল্পীদের নৈপুণ্যের স্বাক্ষর তখন থরে থরে সাজান থাকত সেকালের স্যার স্টুয়ার্ট হক মার্কেটে। ফেলপস অ্যান্ড কোং, মর্গান জোন্স অ্যান্ড কোং প্রভৃতি বিপণির শো-কেস আলোকিত করে রেখেছিল মেটিয়াবুরুজ। বিদেশী পর্যটকে গুলজার গ্র্যান্ড, গ্রেট ইস্টার্নে মেটিয়াবুরুজের দর্জির অবাধ গতি। রইস, খানদানি মুসলমান, নবাব বংশ, সাহেব মেমসাহেব, হৌসের বাবু ও ঊনিশ শতকের উঠতি ধনী বাবুদের মেজাজ, খরচে হাত, জাঁকের ঝোঁক সব মিলে এক শিল্প-প্রেমও ছিল। সেই পরিমণ্ডলে মেটিয়াবুরুজের যে ইজ্জত ছিল ১৯৪০ সালে থেকেই তাতে ঘুণ ধরে। ৪৭ এর পর দর্জি জীবনে নেমে আসে ভয়াবহ ধস।

বিশ্বযুদ্ধের আগ্নেয় অস্ত্র আগুন লাগা বাজারের ঘেরাওর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল দর্জি শিল্পীদের। 'দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশভাগ শুধতে হয়েছে গরীব দর্জিদের রক্ত মূল্যে। দেশত্যাগের হিড়িক, নিরাপত্তার অভাব মেটিয়াবুরুজে পরিশ্রমী মানুষের জীবনের যে স্রোতটি প্রবাহিত ছিল ; ১৯৪০-৫০ এই একটি দশক তা তছনছ করে দেয়। অর্থনৈতিক ভারসাম্যের জোড়াতালি প্রাসাদ অজস্র সামাজিক বিপর্যয়ে তখন ধ্বংসস্তূপ। দলে দলে দর্জির সামান্য ছিটে ফোঁটা জমি, টুকিটাকি সোনার গয়না থেকে বর্তন পর্যন্ত প্রথমে বন্ধক ও পরে বিকিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বেচতে বাধ্য হন রোজগারের যন্ত্রও শরীরের অংশ, উইলসন ও সিঙ্গার মেশিন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় সেই দুর্দিনে শত-শত সিঙ্গার-উইলসন মেসিন মেটিয়াবুরুজের দর্জিরা জলের দরে বেচেছেন। পাথুরে শোকে এই পেশা থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছেন দারিদ্র্যের অতল গর্ভে, অমর্যাদাকর কোন বৃত্তিতে, কেউ-কেউ বেছে নিয়েছেন ভিক্ষাবৃত্তি, আত্মহত্যা করেছেন অভিমানী, সৎ, সরল, পরিশ্রমী মানুষ। অথচ ৪০-৫০ এর কালো দিন ছিল দেশ ও জাতির পক্ষে জাগরণ, বিজয় উল্লাস। এই বিজয় উল্লাসে বিশাল দেশের নানা স্তরের মানুষ পৌঁছেছেন নানাভাবে—মেটিয়াবুরুজের দর্জিরা কাজের কদর হারিয়ে, মেশিন বেচে আত্মহত্যা করে দাঙ্গায় নিহত আত্মীয়ের গভীরতম শোকে, কালো পোশাকটি জড়িয়ে প্রণত হলেন স্বাধীনতার উঁচু বেদীটির কঠিন কংক্রীটে। মেশিন নেই এমন দর্জি কারিগরের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলল উন্নতির পাঁচ বছরকি পরিকল্পনার ২৫-৩০ বছরে। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষের রুটি-রুজির সঙ্গে কোন সম্পর্ক গড়ে উঠল না ব্যাঙ্ক, সমবায় আন্দোলন ও দেশীয় কুটির শিল্পের দরদী প্রতিষ্ঠানগুলির। দেড় লাখ মানুষের বৃহৎ একটি অংশ নেংটি-লুঙি সম্বল করে ঘাড় গুঁজে, কয়েক কোটি মানুষের জন্য কামিজ সেলাই করে যাচ্ছেন দিন-মাস-বছর, বছরের পর বছর। এঁদের শিশুরা নাঙা বিবির পরণে ফর্দাফাই কাপড়, হাঁড়ি বাড়ান্ত।

বিশ্বযুদ্ধ স্বাধীনতা-যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ও মানচিত্র ফেঁড়ে ফেলার একটি দশক মেটিয়াবুরুজকে গায়ের চামড়া দিয়ে বুঝতে হল। গত ৩৩-৩৪ বছরে সাবালক হয়ে ওঠা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এসব তামাম এলাকায় প্রায় আড়াই লাখ মানুষের একটি ভোটার-ফর্দ বানিয়েছে। এছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। দর্জিরা আগে ভাড়ায় মেশিন আনতে পারত, সেসব রীতি এখন হাওয়া। 'ওস্তাগর' শব্দটা হাজার-হাজার মেশিনের শব্দে গলি-খুঁজি ঘুপচিতে শোনা গেলেও এর সঙ্গে আর ওস্তাদ-কারিগরের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন কারিগরের সঙ্গে কুলির নেই এক সুতো ফারাক। তবু ভারতবর্ষের এই ক্ষুদ্রতম গ্রাম-শহরে এলে পাঠক দেখবেন এখানে একজনও বেকার নেই। অখন্ড একটি কর্মস্রোত বয়ে চলেছে। এতে আশান্বিত বোধ করা একটু বিশ্বাস ফিরে পাওয়া বহিরাগতের পক্ষে অনিবার্য। কিন্তু যে মানুষের অন্তত ২০ হাজার টাকার পুঁজি নেই, ৭ বছরের যে শিশুর পিতা দুবাইতে ছুঁড়ে ফেলেছে নিজেকে, যার আর্থিক-যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চ পুরো একটি দুনিয়া এবং যাঁর পক্ষে এক পা হারানো, গুলি-বিদ্ধ, ক্ষত বিক্ষত সৈনিকের মতোই সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে আসাও অসম্ভব নয়। ফাতেমার মতো অপরের বাড়িতে বাসন মাজা থেকে ফুরুনে দর্জি কাজ করা খাটিয়ে মানুষের কাছে এই স্রোত নর্দমার সঙ্গে গুলিয়ে যায়। ৭ বছরের নুর নবীকে বোতাম, হুক বোতাম, তুরকুইয়ের কাজে খাটতে হচ্ছে সকাল থেকে সূর্যডোবা পর্যন্ত। দর্জি মজুরের ডিউটি টাইম বলে কিছু নেই. 'পরপুরুষ কাল থিগি হয়ি আসছে সূর্য ওঠা থেকে সূর্য ডোবা।'

এক রোজ। ঘড়ির টাইম নেই, ছোটবেলা হলে জলদি, বড় বেলায় বেশি টাইম ব্যস। নুর নবী এই নিয়মে কাজ করে যাচ্ছে. হপ্তা দশ টাকা। সুতোকল, তীব্র আলোয় ঝলসান প্রাচুর্যের 'ফিরিঙ্গিপাড়া' (এসপ্ল্যানেড অঞ্চল) ওদিকে ইউরোপ আমেরিকা পর্যন্ত এই দরিদ্র অঞ্চল প্রতিদিনের রুটিকে কেন্দ্র করে ছিটিয়ে দিয়েছে নুরনবীর মতো অজস্র শিশুর কোমল আঙুলের খুন। ৩০ বছর বয়স হলেই মহঃ আলতাফ (১২), মহঃ সাজুর (১৪), সুলেমার (১৬) চোখে ঝাপসা দেখবে, কোমরের দর্দ এবং পেটের গোলযোগে হারাবে যুগপৎ শৈশব এবং যৌবন।

গার্ডেনরিচ মেটিয়াবুরুজ দর্জি মহল্লায় কাজ, পুঁজিও খাটনির হিসেবে মানুষজনকে এভাবে ভাগ করে ফেলা সম্ভব ২৫-৩০ হাজার ওস্তাগর যার মধ্যে ১ হাজার মতো বড় ব্যবসায়ী (৩০-৪০ টি মেশিন চলছে যাঁদের)। ১০.হাজার মাঝারি ব্যবসায়ী যাঁরা আয়-করের আওতায় পড়েন এবং একাংশ নিয়মিত আয়কর দিয়েও থাকেন। বাদবাকির অবস্থা ২-৮ টি মেশিনের মালিক ওস্তাগর, তাঁদের আর্থিক অবস্থা কেরানি-মধ্যবিত্ত থেকে পিয়ন-মধ্যবিত্ত পর্যন্ত কোন না কোন স্তরে ধরা যেতে পারে। একেবারে নিচে কারিগর নামে প্রায় ১ লক্ষ মানুষের যে ভিত্তিটি রয়েছে, তাঁদের অবস্থা ক্ষেতমজুরের সঙ্গেই তুলনীয়। তবে পেটে গামছা বাঁধতে হয়নি এখনও। কারিগরদের ভেতরও ফারাক আছে, মিহি আর মোটা কাজের বাজারের গতিতে, ব্যবসার হাওয়ায় এক নম্বর কারিগর ক্রমশ হাওয়া

হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন স্তরের ওস্তাগর ও কারিগরদের মত হল : কাজের ধারা বদলে গিয়েছে, আগে ছিল বাঁধা বাড়ি, বাঁধা পার্টি। যেমন আলাউদ্দিন মোল্লা বললেন তিনি বাপজনের সূত্রে পার্টি হিসাবে পেয়েছিলেন গোয়েঙ্কা, আর কে ভাওলকার প্রভৃতি ধনী পরিবারকে। বছরের পোশাক বানানর মৌখিক চুক্তি ছিল, কাপড় দেবেন পার্টি দর্জি পাবেন সেলাই খরচ। নিজের মুরোদে আলাউদ্দিন মোহনলাল গুপ্তাকে পান, সি আই টি কাঁকুড়গাছি স্কিম-৬, নিউ আলিপুরের ৬/৭ টা বাড়ি এবং টালিগঞ্জের চৌধুরীবাবুদেরও পার্টি বানিয়েছেন। এসব অর্ডারি কাজই মেটিয়াবুরুজের খ্যাতির আসল কারণ। কিন্তু এ-কাজ করে এখন পেট চালান দায়, সুতরাং হাটের জন্যে মাল বানাও, অর্ডারি ছেড়ে রেডিমেড চালাও। আলাউদ্দিনের মতো এখন-ও রেডিমেড কাজের সঙ্গে খুঁতখুতে বাবুদের অর্ডারি কাজ কজন আর করেন। এখন বাজার হাঁ করে আছে যে যা পার, যত বেশী করে পার হাটে নিয়ে চল। ঘটি-বাটি-বর্তন বেচে ৫ হাজার টাকা যে জোটাতে পারলেন তিনিই ওস্তাগর বনার চেষ্টায় নিজে সর্বসান্ত হন আর মালের দর এমন নামিয়ে আনেন যে ছাপোষারাও মারা যান। ওস্তাগর মহঃ সঈদের কারবারের নাড়ি হাটের সঙ্গে বাঁধা। মোট ৪টে মেশিন চলছে, ১টা সিঙ্গার মেশিন অনেকদিন বিগড়ে আছে ওটা এখন লোহার দরে বেচতে হবে। ৬ বছর বয়স, যখন শিশুর হাতে খড়ি হয়, সেই বয়সে সঈদকে পাঠান হয় অন্যের কারবারে মজদুরি করতে। সঈদের বাবার নিজের মেশিন ছিল না, তিনি দর্জি কারিগর হিসেবে জীবন শুরু করেন, এন্তেকালেও ছিলেন খাটিয়ে কারিগর। ছেলে সঈদ ১২ বছর লাগাতার ১০-১২ ঘণ্টা গতর খাটিয়ে পয়লা ১ খানা মেশিন কিস্তিতে কেনেন। বাল-বাচ্ছা-বিবি নিয়ে ঘর, ঘরখানার ভাড়া লাগে না। দাদাকেলে বাড়ি। এখানে ৪ পুরুষের বাস। বাপ দাদার মুখে শোনা বানভাসিতে সব এখানে এসে ওঠেন। সঈদ নিজে ভালো কাট ছাট জানেন, তবে কাজের দস্তুর এখানে আলাদা। তিন চার কিসিমের সাইজ হয় ১৪-১৬-১৮, ২০-২২-২৪। এরকম সমস্ত কামিজই সরল বালিকার নানা ডিজাইনের মিডি। সাইজ অনুযায়ী পিচবোর্ডের ফর্মা কাটা আছে, তাতে ফেল আর কাঁচি চালাও। সঈদকে এর মধ্যেই উদ্ভাবনী শক্তির স্বাক্ষর রাখতে হয়। ফ্যাশনের পত্রিকার সঙ্গে তাঁর কোন জানকারি নেই, আলাদা করে ফ্যাশন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের কোন সুযোগ ঘটেনি তাঁর জীবনে। তবু তাঁর করা ডিজাইন হরিসা হাটে বার কয়েক হিট হয়েছে। বাহ্যত, কারিগর, শেখ আবদুল হান্নান (২৭) শেখ আবদুল সাত্তার (২৪) প্রভৃতিকে সঈদের সঙ্গে একই পরিবারভুক্ত মনে হবে। এইসব মজুর এসেছেন মগরাহাট হুগলী মেদনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। থাকা-খাওয়া সঈদের কাছে। খাওয়া বাবদ রোজ কাটা যায় ৩ টাকা। হাটের কাজে মজুরি কম গড়ে আটটা টাকা। রোজ কাজের একটা কোটা থাকে। বাইরের কারিগররা অবশ্য এই যৌথ-পরিবার-জীবনে শ্বাস ফেলার সময় পান না, এক ধরনের বন্দী-দশাই বলা চলে। কাজের এই পরিবেশ ও বন্দোবস্তের জন্য সঈদের মতো নেহাতই মাঝারি ব্যবসায়ীর বিশেষ কিছু করার নেই। তবু শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থাটি বন্ধুকি মজদুরির নামান্তর। একই ধর্মে বিশ্বাস, জমির সঙ্গে

অতীত সম্পর্ক থাকা, সব মিলে ওস্তাগর ও কারিগররা বেশ জড়িয়ে আছেন। ছোট ও মাঝারি ওস্তাগরের পরিবারের লোকজনকেও কোন-না-কোনভাবে কাজে হাত লাগাতে হয় বলেও মজুর-মালিক ব্যবধানের তীব্র প্রকাশ ঘটে না। আর এই অপ্রকাশের জন্য আবদুল হান্নান ও আবদুল সাত্তারের মতো মজুরের খার্টুনির কোন অন্ত থাকে না।

পাঁচপাড়া-বাদামতলা-বটতলা-সন্তোষপুর-আক্রা-বদরতলা-মালিপাড়া-হাজিরতন মারে রোড—ধোপাপাড়া পর্যন্ত ১৬ ঘণ্টা মেশিনের চাকা ঘুরছে। কোথাও লেডিজ, কোথাও জেন্টস কোথাও বর্ষাতি সেলাই। আগে বড়বাজারের মাড়োয়ারির আড়ত থেকে মাল কিনে আনতে হত—এখন মেটিয়াবুরুজেই বসান হয়েছে ইসলাম বাজার। মাড়োয়ারি কাপড়-ব্যবসায়ীরা এখান থেকে থান কাপড় বিক্রি করছেন। সুতি কাপড়ের যুগ চলে গিয়েছে, এখন 'ডালডা' মাল, অর্থাৎ সিন্থেটিকের ভেজাল। ১ মিঃ কাপড়ের বাজার-দর ১২ টাকা হলে কিস্তি বন্দোবস্তে দিতে হচ্ছে ১৪ টাকা। ২০ মিঃ কাপড়ের থান থেকে ১৬-২৪ সাইজের ২০ পিস মাল বানান যায়। মাল পিছু অন্যান্য খরচ ৩ টাকা (মজুরি বোতাম, সুতো মেশিনের ক্ষয় ধরা হয় না) হাটে মালের গড় দর ১৮ টাকা। ওস্তাগরের ১ খানা জামায় থাকে ১ টাকা। এর মধ্যে পরিবহণ খরচ আছে। ১টা মেশিনে রোজ ৮ খানা মাল হয় গড়ে। বাজার চালুর সময় ১০-১২ খানা মাল ও মেশিন পিছু উৎপাদন হয়। এই চালু বাজার হল পুজো, ঈদ আর ইংরেজী বাংলা নববর্ষ সব মিলে বছরে ৪ মাস, গত কয়েক বছরে লোডশেডিং এই ৪ মাসের কাজের মরশুমকে বিপর্যস্ত করেছে। কারণ এ ৪ মাস দর্জির জীবনে রাত দিনের কোন ফারাক থাকে না। তারা মেশিনেরই অংশ তখন। ইসমাইল মার্কেট, মাল মার্কেট, রোশন মার্কেটের ৫০০ দোকান কাপড়ের যোগানদার হওয়াতে মালিক ওস্তাগরের সুবিধে হয়েছে। কিন্তু মঙ্গল, শনি ও বুধের হাটে (হাওড়া হাট, হরিসা হাট, চেতলা হাট) মাল নিয়ে যেতে তারা জেরবার। মাল ছিনতাই থেকে শুরু করে পুলিসের জুলুম, ট্যাক্সি ড্রাইভারের খাই মেটাতে মাথায় খুন চেপে যায়। মাল নিয়ে যেতে হয় ভোর রাতে. ফলে রাত ২টো থেকে মংলার হাটে যাওয়ার ধুন্ধুমার কান্ড শুরু হয়ে যায়। একখানা ট্যাক্সি এলে ওস্তাগররা হুমড়ি খেয়ে পড়েন। মাথা পিছু ১০ টাকা নিয়ে চালক ট্যাক্সির খোলে ৮ জনকে ঠেসে দেন। অনেক আর্জি পেশ করেও ওপর মহল থেকে বাসের সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়নি। এরপর আছে হাট হামলা, সেখানে হাজার-হাজার টাকা পাগড়ি না দিলে খুপরি পাওয়া যাবে না। অথচ হাটের কর্মকর্তারা মস্তানের জুলুম থেকে এঁদের রক্ষার দায়িত্ব নেবেন না, প্রাতঃকৃত্যের কোনরকম ব্যবস্থা থাকবে না—হাট মানে দোজখ। 'আমাদের এক-পা দোজখের পানে ..'

নাঙা হিন্দুস্থানের গত ভোটযুদ্ধে গার্ডেনরিচ এলাকায় যে ৬৬,৩৩১ জন মানুষ ভোটপত্র হাতে শামুকের মতো এগিয়ে যাচ্ছিলেন বুথের দিকে তাঁদের মধ্যে শেখ মহম্মদ মুশা একজন। মহঃ মুশার গণতন্ত্র ও ভোট বিষয়ক ধারণাটি বেশ। গ্রাম্য মেটিয়াবুরুজ

থেকেই তাঁর সমস্ত ভাবনা শুরু, শেষও মেটিয়াবুরুজেই। জন. প্রতিনিধির সঙ্গে নবাবের পার্থক্য গুলিয়ে ফেলেন। মেটিয়াবুরুজে সমস্য অনেক, সজারুকাঁটার মতোই তীব্র তীক্ষ্ম। ভাত-কাপড়, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পরিবহণ প্রভৃতি সরাসরি সমস্যায় এ-অঞ্চলে কোন ছলনা নেই, বরং তা ক্ষুদে ভারতবর্ষ। প্রধান সড়কটি গর্তের মিছিল, দর্জিপাড়ায় আলো, জল ও রাস্তার ভয়াবহ অবস্থা। আর আছে পচা ডোবা, খাটাল, আবর্জনা, ধোঁয়া-ধুলো। মহম্মদ মুশা তিন-চার পুরুষের দর্জি, নিজে সূচ ধরেন ৯-১০ বছর বয়সে, ৫৭-৫৮ বছর টানা দর্জি-কাজ করে যাচ্ছেন। নিজের অভিজ্ঞতা যেটুকু, দর্জিমহল্লার খাটিয়ে মানুষের প্রতিচ্ছবি তাতে স্পষ্ট। একটি শতকের আধখানা তাঁর পুঁজি। বিপদ-আপদ ঈদ-বকরঈদ-ভোট-অভাব-হাওলাতের ক্যালেন্ডার এই অর্ধ শতকে তিনি চামড়া দিয়ে বুঝেছেন। দর্জির হাত নেই, দর্জির হাত হল মেশিন। আর 'আল্লার কসম মেটিয়াবুরুজের খাটুয়ে কারিগরির একজনারও মিশিন নেই। পিচ বোর্ডের মাপে কাটা কাপড় মেশিনের দাঁতের নিচে ফেলে ১০-১২ ঘণ্টা ঘাড় গুঁজে থাকায় মাথা পর্যন্ত সেলাই হয়ে যায়। সেলাই কারিগর তাঁরা। ঘরে বিবি ফোড়নের কাজ করেন, বাল-বাচ্ছা পেটে আসে, রোগে-ভোগে-খাটনিতে তাঁরা শীর্ণ, ফ্যাকাসে, পর-পুরুষ দেখলে কোথায় লুকিয়ে পড়েন। এখনও খানদানি ঘরের বিবি-বেটি কাপড় দিয়ে রিক্সা ঘিরে নেন। যে দু-চারজন ইস্কুল-কলেজ যান, তাঁরাও পাড়ার বাইরে গিয়ে বোরখা তোলেন। তবে তাঁরা গরিব দর্জি ঘরের নয়। গরিব দর্জি ঘরের মধ্যে মেয়ে সূতিকা রক্তাপ্লুতা আর গাধার খাটনিতে মৃত প্রায়। মেটিয়াবুরুজের বাইরে তাঁরা ক্বচিৎ বেরিয়েছেন। আর মা হতে গিয়ে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফি বছর ২০-৩০ জনের মৃত্যু ছিল অবধারিত। এখানে পয়দাসি (জন্ম) এরকম বৃদ্ধ মজুররা তাবৎ এলাকায় যেটুকু উন্নতি দেখছেন তার সঙ্গে দর্জি মজুরের সম্পর্ক নেই। লেখাপড়া হচ্ছে, গোঁড়ামি কাটছে, কপালও ফিরেছে অনেকের—কিন্তু এর মধ্যে মজুর কোথায়? দর্জি মজুর হলেন এমন মানুষ যিনি নিজে নাঙ্গা, ভুখা, অথচ যাঁর দু-হাত-কাঁধ-পা-পিঠে ছোট-ছোট ঢেউ, ঐ ঢেউ সেলাইয়ের ছন্দ।

এই দর্জিরা সি এম ডি এ দেখেছেন, ব্যাঙ্ক দেখেছেন, ডান-বাম সরকার দেখলেন। শুনেছেন সমবায় দপ্তর, কুটির শিল্প মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কথা। আর চোখের সামনে দেখতে পান কিছু ফুলে-ফেঁপে ওঠা ওস্তাগর, মাড়োয়ারি মহাজন আর নানা রঙের সিন্থেটিক কাপড়। এর মধ্যে মুখে রক্ত তুলে তুচ্ছ দর্জি-মজুদের কেউ-কেউ নিজেদের জবানি যৌবন) কে পিষে, শাদি না করে, না-খেয়ে বিরামহীন খেটে চলেছেন যদি ১ খানা মেশিন কেনা যায়, যদি কোনদিন ওস্তাগর হওয়া বায়। মহঃ মুশার এই প্রতিযোগিতায় সামিল হওয়ার বয়স নেই, তাছাড়া এ এক মরীচিকা। মেশিন কিনতে পারলেও মেশিন রাখতে পারা দুষ্কর, বাজারের সঙ্গে যুঝে ২-১ খানা মেশিনের মালিকেরা টিকে থাকা আরব্য কাহিনীর মতোই অলৌকিক। বাকি থাকে মধ্য এশিয়ায় পাড়ি দেওয়া, তা কম করে ২-৩ শ দর্জি ঘটি বাটি বেচে সে রাস্তাতেই হাঁটা দিয়েছেন। এখন

ঐ সাগর মরু পেরনোর দর্জি অভিযানেও ভাঁটা এসে গিয়েছে। গাছের ফলে হতাশা ছাড়া ভাঁড়ারে কিছুই পড়ে থাকে না-হতাশার ন্যাড়া মাঠে মেটিয়াবুরুজ বিলকুল নিজের মুরোদ গড়ে তুলেছে একটি সেবা সদন : মেটিয়াবুরুজ সেবাসদন। হাসপাতালের অভাবে রাত-বিরেতে মৃত্যু-ভোগান্তি সত্ত্বেও গরিব দর্জিদের পক্ষে এ নিয়ে ভাবার, উদ্যোগ নেওয়ার কোন অবসর ছিল না। যেমন এই ১৯৮১ সালেও মজুরদের নিজস্ব কোন ইউনিয়ন নেই, সমবায় নেই, শিক্ষা নেই, বিনোদন নেই। ঠিক সেই রকম স্বাস্থ্য নেই, হাসপাতাল নেই। এই নেই অবস্থার খিলাপে অঞ্চলের কিছু মধ্যবিত্ত মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল উদ্যোগ গ্রহণের।

শুরুতে এলাকায় 'সংকল্প' নামে একটি দেওয়াল পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। জনা পঁচিশেক মানুষ জড়ো হন, পরবর্তী ধাপে চালু করা হল নাইট স্কুল। বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়ার এই প্রয়াসে শেষ পর্যন্ত খুব কম ক্ষেত্রেই দম রাখা সম্ভব হয়। মেটিয়াবুরুজের স্কুলটির ভবিষ্যতও সেই নিয়মে তমসার গহ্বরে। কিন্তু কাজের কাজ একটা হল ৬৯ সালে পাঁচ পাড়ায় নজরুল ইসলামের বাড়িতে খোলা হল দাতব্য চিকিৎসালয়। গরিব অঞ্চলের নানা সমস্যা বিবেচনা করে প্রথমে এখানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু হয়। রুগীদের কাছ থেকে ০.১০ পয়সা করে নেওয়া হত টোকেন হিসেবে। চিকিৎসার এই বীজ থেকেই পরে গড়ে তোলা সম্ভব হয় মেটিয়াবুরুজ সেবা প্রতিষ্ঠান। ইসলাম ধর্মে জাকাত-ফেতরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালনীয়, এই ধর্মীয় আচারে বাৎসরিক আয়ের ১-৩ শতাংশ কর হিসাবে দরিদ্র অসহায় মানুষের মঙ্গলার্থে ব্যয় করতে হয়। ফকির সিমফিনের প্রাপ্য সেই অর্থের সঞ্চয় গড়ে তুললেন উদ্যোক্তরা। বকরঈদে তামাম এলাকায় ৫০০-৬০০ গোরু কুর্বানি হয়, গোরুর চামড়া ও হাড় বিক্রয় টাকাটাও তহবিলকে পুষ্টি জোগাল। অতঃপর স্থানীয় মধ্যবিত্তের অধিকারী, কোমল হৃদয় একজন ৬ কাঠা জমি কোবালা করে দেন হাসপাতালের নামে। ৩-৯-৭৭ তারিখে ৬ খানা বেড সমেত সেবাসদন প্রধানত প্রসূতিসদন হিসাবে কাজ শুরু করল। প্রভূত পরিশ্রমে গড়ে তোলা সংস্থার প্রতিটি পয়সা কর্তৃপক্ষ এক ফোঁটা রক্ত জ্ঞানে খরচ করতেন, যেসব সন্তান সম্ভবা নারীর সামর্থ্য আছে তাঁদের কাছ থেকে ভর্তি ফি বাবদ ৩০ টাকা নেওয়া হয়। সুব্যবস্থার ফলে, দোতালা, ১৫টি বেডের বর্তমান সেবাসদন গত বছর ৩৯ হাজার টাকা জমাতে পারে। এ তাঁদের অপরাধ, ফলে সরকারি অনুদান, সাহায্য পাওয়ার যোগ্যতা থেকে তাঁরা ভ্রষ্ট হলেন। অন্যদিকে বহুবার তাঁরা সরকারকে হাসপাতাল অধিগ্রহণের আবেদন করেছেন, প্রত্যুত্তরে বরফ-স্তব্ধতা ছাড়া কিছুই টের পাননি। সি এম ডি এ মারফৎ ১৯৭৭ সালে নেদারল্যান্ড গভর্মেন্টকে একটি প্রস্তাব পাঠান হয় সাহায্য প্রার্থনা করে। ১৯৮১ তে সেই টাকা পাওয়া গিয়েছে—শুধু ইতিমধ্যে এক্সরে মেশিন, অ্যাম্বুলেন্স, ল্যাবরেটরি নির্মাণের ব্যয় অনেক বেড়ে গিয়েছে। ফলে প্রাপ্ত টাকায় কুলোয় নি। যদিও সেবাসদনের এখন একটি অ্যাম্বুলেন্স, এক্সরে মেশিন ও নিজস্ব ল্যাবরেটরি

হয়েছে। এদেশের একটি প্রতিষ্ঠান 'টাইম ট্যালেন্টস ক্লাব' তাঁদের সাহায্য করেছেন ৫৮ হাজার টাকা।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে জানা গেল এ পর্যন্ত তাঁরা ২০০টি লাইগেশন করেছেন। আশ্চর্য এ বিষয়ে এমন কিছু প্রচারও চালাননি। এটি যদি তাঁদের সাফল্য হয়, যদি এর মধ্যে তাঁরা খাটিয়ে মানুষের গোঁড়ামির শামুক খোলা ভেঙে বেরিয়ে আসা, এক রকম জাগরণ প্রত্যক্ষ করেন তো আরেকদিকে তাঁরা সর্বদা যা দেখেন তাতে শিউরে উঠতে হয়। হাসপাতালে পয়দার সময় শিশুর ওজন তাঁদের আনন্দ দেয়—কিন্তু ঝুপড়িতে ফিরে যাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যেই শিশুটি অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। এই শিশুর স্বাস্থ্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য অনুদান ও প্রয়াসে রক্ষা পাবে সেবাসদনের পক্ষে তাঁর কূল-কিনারা করা সম্ভব হচ্ছে না। কোথাও, এক জায়গায় এসে কি থেমে যেতেই হবে ?